উন্নয়নের সূচক নিয়ে বিতর্ক - সংখ্যাডোরে যায়না যারে বাঁধা ?

মৈত্রীশ ঘটক

১

কেমন আছি আমরা? দেশের কি হাল? ইন্ডিয়া শাইনিং না ইন্ডিয়া ড্রাউনিং, মানে দেশ ঝকঝক করছে, না তলিয়ে যাচ্ছে? একদিকে খোলামেলা অর্থনীতির দামাল হাওয়ায় সব এলোমেলো । অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতার মায়াবী হাতছানিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সবাই, দুদণ্ড জিরোবার অবকাশ নেই । অন্যদিকে ভোগবাদী সমাজের অনন্ত ক্ষুধা মেটাবার জেরে বাজার অর্থনীতির জাঁতাকলে শ্রমিকেরা শ্বাসরুদ্ধ, পরিবেশ বিপন্ন, সমাজ হয়ে উঠেছে অনেক একক ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র, ভাঙছে পরিবার, বাড়ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ, এবং মানসিক অবসাদ।

উন্নয়নের ধারণাটির পেছনে সম্ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যে একটা ফারাক, আর বিকাশের প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবার একটা আশা, এই দুটি উপাদানই আছে। কিন্তু উন্নয়নের সূচক কি, আর কোন পথে উন্নয়ন হবে, এর কোনটা নিয়েই বিতর্কের শেষ নেই । আমাদের আর কি দোষ, এসব নিয়ে অমর্ত্য সেন ও জগদীশ ভগবতীর মধ্যেও তো সম্প্রতি তুমুল বিতর্ক হয়ে গেল।[i] উন্নয়নের আশায় কত মতবাদ, কত পথ পার হয়ে এলাম আমরা, নেহরুর সমাজবাদ থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সমাজবিরোধীবাদ, নব্বইয়ের দশকের উদারনীতিবাদ থেকে সাম্প্রতিককালের উদার-দুর্নীতিবাদ, এখনো পথের দিশা পাওয়া গেলনা।

যদি পথের দিশা খুঁজতে দেশের বাইরে তাকাই, সেখানেও ছবিটা খুব গোলমেলে। এতদিন যতই হোক মাথার ওপর সমাজতন্ত্রের একটা আশ্বাসের ছাউনি সম্বল ছিল, এখন তাও নেই। পূর্ব ইয়োরোপের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশের ঘুণধরা অর্থনীতি ও দমনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায়, চে গ্যেভারার পুরনো পোস্টার, বইয়ের তাকে কার্ল মার্ক্সের দাস ক্যাপিটাল, আর

পশ্চিম ইয়োরোপের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মডেল ছাড়া সে সব স্বপ্ন অন্তত এই মুহূর্তে সুদূরপরাহত । রাশিয়া ডুবে আছে ভদকা ও মাফিয়ায়। হায় চিন, সেও কথা রাখেনি। এক দিকে আসল ধনতন্ত্র কাকে বলে তা আমেরিকা-ইয়োরোপকে শেখাচ্ছে, আর অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সীমান্তে খালি খালি আশঙ্কা জাগিয়ে চলেছে "একদিন চিনে নেবে তারে"। সে মাও-ও নেই, সে পিকিং-ও নেই, অবশ্য খোদ চিনে না থাকলেও আমাদের দেশে মাওবাদীরা এখনো আছে।

এখন "আমরা কেমন আছি" বা "দেশের কি হাল" এইসব প্রশ্নের উত্তর কখনই পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক হয়না । যেমন, বিষাদবিলাস আমাদের বাঙালিদের জাতিগত ধর্ম, তাই যাই হোকনা কেন একটু "মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে" বা "শপিং মলের থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে এক শীর্ণ শিশুকে দেখে মনে হল ঠিক যেন নীরেনবাবুর সেই কলকাতার যীশু" এই ধরণের অনুভূতি আমাদের অতিপরিচিত । তার জন্যে শপিং মলে গিয়ে পে কমিশনের বা আর্থিক উদারীকরণের বদান্যতার কড়ি ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়সুখে অনায়াসে ব্যয় করতে আমাদের বাধেনা, কিন্তু চূড়ান্ত ভোগবিলাসের মুহূর্তেও নেপথ্যে অনিবার্য বেহালার উদাস মূর্ছনা হল আমাদের জীবনযাত্রার মানের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সুখ ব্যাপারটা বড্ড মোটা দাগের। সেই গুস্তাভ ফ্লবেয়ার বলেছেন না, সুখী হতে গেলে বোকা, স্বার্থপর এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক, তার মধ্যে প্রথমটা না হলে অবশ্য সব মাটি। বাঙালিদের মত ফরাসীরাও বিপন্ন বিস্ময় ভালবাসেন, সুখের স্রোতে গা ভাসানো সম্পর্কে অন্তত মুখে প্রচুর অনীহা ।

আবার এও সত্যি, উন্নয়নের বা জীবনযাত্রার মানের অনেক ধরণের সূচক হয়, যা নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিগত অনুভুতির ওপর নির্ভরশীল নয় যেমন মাথাপিছু গড় আয় (per capita income), বা দারিদ্ররেখার নিচে থাকা জনসংখ্যার অনুপাত, বা গড় প্রত্যাশিত আয়ু (average life expectancy) । কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিক হলেও কোন সূচকই জীবনযাত্রার মানের মত

বহুমাত্রিক একটা বিষয়কে ঠিকমত ধরতে পারেনা, তাই বিতর্ক চলতেই থাকে। মোদীর মোদক খেয়ে যাঁরা বিশ্বজয়ের খোয়াব দেখছেন তাঁরা বলবেন গুজরাটের আর্থিক বৃদ্ধির হার কত ভাল, আবার যাঁরা মানব উন্নয়নের সূচক বা শিশুমৃত্যুর হার দেখবেন, তাঁরা হয়তো সেই কাক্কেশ্বর কুচকুচের মত বলবেন, হয়নি, হয়নি, ফেল।

২

পরিসংখ্যান কি বলছে? ভারতের উন্নয়নের রিপোর্টকার্ড টা কিরকম? কি বেড়েছে, কি কমেছে, অন্য দেশের সাথে তুলনায় আমরা কোথায়?[ii] সরকারি পরিসংখ্যান দেখলে এই তথ্যগুলো নিয়ে কোন বিতর্কের জায়গা নেই যে গত কয়েক দশকে আমাদের জাতীয় গড় আয়ের বৃদ্ধির হার বেড়েছে, আর তাই জাতীয় আয়ের মান অনেকটা বেড়েছে, আর প্রথাগত ভাবে মাপা দারিদ্র-রেখার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা অনেকটা কমেছে। আমাদের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ১৯৯০-এর দশক থেকে শুধু যে বেড়েছে তা নয় (অনেকের মতে এই বৃদ্ধি ১৯৮০ থেকে শুরু), ওঠানামা সত্ত্বেও আগের জমানার বৃদ্ধির হারের থেকে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। পশ্চাৎপদ জাতির মানুষদের মধ্যেও দারিদ্র উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। এগুলো হল ভালো খবর। খারাপ খবর হল দারিদ্র রেখা যদি একটু বাড়িয়ে ধরা হয়, যেমন এখন যা ব্যবহার করা হয়, তার দ্বিগুণ (যা এখনকার মূল্যে মাথাপিছু প্রতিদিন শহরে ৩২-এর জায়গায় ৬৪ টাকা আর গ্রামে ২৮-এর জায়গায় ৫৬ টাকা মাত্র), তাহলে দারিদ্র দূরীকরণের ছবিটা মোটেই উজ্জ্বল দেখাবেনা। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে ৪৫% থেকে কমে ২৮% হবার বদলে, তা দাঁড়াবে ৮৬% থেকে কমে ৮০% হওয়া। মানব উন্নয়নের নানা সূচক যদি দেখি, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তাহলে চিনের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বাংলাদেশও (যার গড় জাতীয় আয় ভারতের প্রায় অর্ধেক) অনেক ক্ষেত্রে আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। তাছাড়া মজুরির হার গড় জাতীয় আয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি, এবং বৈষম্যের সূচক দেখলে, গত কয়েক দশকে বৈষম্য

খানিকটা বেড়েছে। তাই প্রদীপের ওপরে তাকালে নিশ্চয়ই আলোর দীপ্তি দেখা যাবে, যা থেকে কেউ দেশকে উজ্জ্বল দেখতেই পারেন, কিন্তু প্রদীপের তলায় অন্ধকার অনস্বীকার্য।

তাহলে কোন সূচক ব্যবহার করব আমরা, এবং বিভিন্ন সূচকে আলাদা আলাদা ফল বেরলে তার থেকে সার্বিক ছবিটা কিভাবে যাচাই করব?

উন্নয়নের সূচকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সরল হল গড় জাতীয় আয় এবং তার বৃদ্ধির হার। সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও উন্নয়নের সূচক হিসেবে গড় আয়ের সীমাবদ্ধতা প্রচুর । এতে ধরা পড়বে শুধু যে সব পণ্য ও সেবা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তার মূল্য। জীবনযাত্রার মানের আবশ্যক যা যা উপাদান, যেমন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-পরিকাঠামো-আইনশৃঙ্খলা তার কিছুই এতে ধরা পড়বেনা। শুধু তাই না, এখন তো জীবন নিয়ে সার্বিক তৃপ্তি (life satisfaction) বা সুখ (happiness) নিয়েও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। এগুলির ভিত্তি হল সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে "আপনি কি নিজেকে সুখী বলে বর্ণনা করবেন?" এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর। রিচার্ড লেয়ার্ডের মত অর্থনীতিবিদের মতে, এটাই হল জীবনযাত্রার মানের আসল সূচক কারণ আর বাকি সবগুলি তার উপাদান মাত্র । তবে এই সূচকটির কোন নৈর্ব্যক্তিক মাপকাঠি নেই, ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সামাজিক-প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল।[iii] তাই দুই দেশ বা দুই সময়ের তুলনামূলক বিচারে ব্যক্তিগত অনুভুতি-নির্ভর এই সূচকগুলি খুব একটা কাজে আসেনা।

জাতীয় আয় যদি উন্নয়নের সূচক হিসেবে বড্ড সঙ্কীর্ণ হয়, আবার জীবন নিয়ে তৃপ্তি ব্যাপারটা যদি বড্ড ধোঁয়া ধোঁয়া হয়, তার মাঝামাঝি রফা হল মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)। এই সূচক যে ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তা হল অমর্ত্য সেনের সামর্থ্য-তত্ত্ব (capability theory)। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল সামর্থ্যের ক্রমবিকাশ, কারণ মানুষ কিভাবে

ভালো থাকবে তা নীতির দ্বারা নির্ধারণ করা যায়না বা তাকে মাপাও মুশকিল, কিন্তু সে যাই করুক না কেন, তার সামর্থ্যর বিকাশ তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করবে। মাহবুব উল হক এবং অমর্ত্য সেন প্রবর্তিত এই সূচকটি রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়নের রিপোর্টে ১৯৯০ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হলে এর উল্লেখ হবেই। এটি মূলত তিনটি সূচকের গড়, তার একটি হল গড় জাতীয় আয়, একটি হল গড় আয়ু (যা হল স্বাস্থ্যের মানের সূচক) এবং তৃতীয়টি হল শিক্ষার মানের একটি সূচক। আগে এটার ভিত্তি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষরতার হার, এবং স্কুলে ভর্তি থাকার হার (enrolment rate), ২০১০ সাল থেকে এটার ভিত্তি হল গড় স্কুলশিক্ষার মেয়াদ (mean years of schooling)। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা শুধু জাতীয় আয় বাড়ানোর সহায়ক উপাদান নয়, জীবনযাত্রার মানেরও এক আবশ্যক মাত্রা। তাই ফ্লবেয়ার "সুখী" কে তা নিয়ে ঠাট্টা করলেও, সুস্বাস্থ্যের কথা কিন্তু উল্লেখ করেছেন। তবে সামর্থ্যের নির্ধারক শুধু শিক্ষা বা স্বাস্থ্য নয়, একজন নাগরিকের নানা অধিকারের ওপরেও নির্ভরশীল। যেমন, যেখানে নাগরিকদের নানা গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেখানে শুধু শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আয় দেখলে যে ছবিটা পাওয়া যাবে তা খুবই সীমিত। এই অধিকার লঙ্ঘনের নানা রকম রূপ হতে পারে, যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা, অপরাধ বা লুটতরাজ, দাঙ্গা, পুলিশ বা প্রশাসনের দ্বারা আইনবহির্ভূত ভাবে দমন-পীড়ন, এবং নাগরিকদের সম্পত্তি বা জীবিকা অর্জনের উপায় জোর করে কেড়ে নেওয়া (যেমন, শিল্পের জন্যে জমি অধিগ্রহণ অথবা আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে খনি থেকে খনিজপদার্থ আহরণ)। এই নিয়ে কিছু কিছু সূচক এখন মানবাধিকার সংস্থা গুলি (যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল) প্রকাশ করে, কিন্তু উন্নয়নের সূচকে তার ব্যবহার এখনো চোখে পড়েনি।

এতো গেল একদিক। মাথা পিছু গড় আয়ের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হল এতে আয়ের বৈষম্য ধরা পড়বেনা। দুই জায়গায় গড় আয় এক হলেও, একজায়গায় চরম দারিদ্রের পাশাপাশি সীমাহীন বৈভব থাকতে পারে, আর অন্য জায়গায় আয়

অনেকটা সমভাবে বন্টিত হতে পারে। আমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক কল্যাণের মাপকাঠি যদি প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল হয়, তাহলে উন্নয়নের সূচকে সার্বিক আয় না দেখে আয়ের বণ্টনও দেখতে হবে। এর সবচেয়ে প্রচলিত সূচক হল, দারিদ্র্য রেখার নীচে জনসংখ্যার অনুপাত । কিন্তু এ থেকে বৈষম্য সম্পর্কে খুব সীমিত তথ্য পাওয়া যায় - দারিদ্র রেখার ওপরে যারা তাদের মধ্যে বৈষম্য, এবং তাদের সাথে দরিদ্র শ্রেণীর বৈষম্য এ নিয়ে কিছু জানা যায়না। তা ছাড়া বৈষম্য একটা আপেক্ষিক (relative) সূচক, আর দারিদ্র্য রেখা একটি অনাপেক্ষিক (absolute) সূচক, তাই বৈষম্য এবং দারিদ্রের কোন আবশ্যক সম্বন্ধ নেই, একটা বেশি একটা কম হতেই পারে। আয়ের বৈষম্যের প্রত্যক্ষ যে সূচক গুলো আছে তাদের পেছনে মূল ধারণাটা হল দেশের নাগরিকদের যদি আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়, তারপর তাদের প্রথম ১% জাতীয় আয়ের কত শতাংশ পায়, প্রথম ১০% জাতীয় আয়ের কত শতাংশ পায় এই তথ্য জানা যায়, তাহলে সেগুলো থেকে বৈষম্যের একাধিক সূচক বানান যায়। সর্বাধিক ব্যবহৃত বৈষম্যের সূচক হল জিনি সহগ (Gini coefficient) । সবার আয় সমান হলে প্রথম ১% বা ১০% জাতীয় আয়ের ১% বা ১০%-ই পাবেন কিন্তু আয় বৈষম্যের ফলে, প্রথম ১% জাতীয় আয়ের ১%-এর অনেক বেশি পান। জিনি সূচকটি এই ফারাকের একটা সার্বিক গড় পেশ করে । যদি জিনি সহগের মান শূন্য হয়, তার মানে সবার আয় সমান, আর জিনির মান যদি এক হয়, তার মানে প্রথম ১% জাতীয় আয়ের ১০০%-ই পান, বাকিদের ভাগে জোটে শূন্য।

উন্নয়ন “মাপার” যে চারটি মূল সূচক, গড় জাতীয় আয়, মানব উন্নয়ন, দারিদ্ররেখার নীচে থাকা জনসঙ্খ্যার অনুপাত, এবং জিনি সহগ, সেগুলোর কথা বললাম। আরও কিছু সূচক ব্যবহার হয় উন্নয়নের আলোচনায়, তার অধিকাংশই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে মানব উন্নয়ন সূচকে ব্যবহৃত মাপকাঠিগুলির বিকল্প, যেমন শিশুমৃত্যুর হার, শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার, স্কুলের বিভিন্ন স্তরে ভর্তির

এবং পাশের হার ইত্যাদি। অমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রেজ-এর সাম্প্রতিক বই ‘ইন্ডিয়া: অ্যান আনসার্টেন গ্লোরি’ তে এগুলির উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এগুলি সব বাদ দিলেও, উন্নয়নের আরও অনেক সম্ভাব্য মাপকাঠি আছে, যা গুণগত ভাবে খানিকটা আলাদা। তার সবকটি নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব, কিন্তু কয়েকটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, জাতীয় আয়ের গণনায় এই আয় উৎপাদনের জন্যে যে মূলধন প্রয়োজন, ব্যবহারের ফলে তার যে মূল্য হ্রাস বা ক্ষয় ক্ষতি হয় সেই অঙ্কটি বিয়োগ করা হয় । অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে অবচয় (depreciation) । এর পেছনে চিন্তাটা হল, জাতীয় আয় তো শুধু একবার উৎপাদন করে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবেনা, বারে বারে যাতে এই আয় (বা তার বেশি) অর্জন করার সামর্থ্য থাকে তবেই তো সেটা উন্নয়ন, তা না হলে এতো বহু প্রজন্মের সঞ্চিত সম্পদ রাতারাতি বিলাসে উড়িয়ে দেবার সমান হবে। কিন্তু এই গণনায় পরিবেশ বা প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য হ্রাস বা ক্ষয় ক্ষতির হিসেব ধরা হয়না। অথচ পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের প্রমাণ আমাদের চারদিকে। ঘরবাড়ি, পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতির মত মানুষের হাতে তৈরি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত বা নিঃশেষ হলে তাকে আবার গড়ে তোলা যায়, যায়না প্রাকৃতিক সম্পদ। আবহাওয়ার গতিবিধি পাল্টে যাবার ফল কৃষকেরা ভুগছেন, দূষণের প্রভাবে বাড়ছে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, এবং মাত্রাহীন নির্মাণকাজ ডেকে আনছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংসের তাণ্ডব। এই সব ক্ষয়ক্ষতির ভার শুধু বর্তমান প্রজন্মই বইছেনা, এই মারাত্মক উত্তরাধিকার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর । এখনো অর্থনীতিবিদরা এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। ব্যতিক্রম হলেন কেনেথ অ্যারো এবং পার্থ দাশগুপ্তর মত গবেষকেরা যাঁরা আর্থিক ও মানব সম্পদের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের মানও উন্নয়নের সূচকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। আন্দাজ করা যায়, চিন, যেখানে আর্থিক বিকাশের হার খুবই

বেশি, পরিবেশের মান কে অন্তর্ভুক্ত করলে তার উন্নয়নের মান অতটা সাঙ্ঘাতিক মনে হবেনা।

দ্বিতীয়ত, যে সমাজে শিশুকন্যারা চরম বৈষম্যের শিকার, সেখানে উন্নয়নের শুধু সার্বিক সূচক দেখলে হবেনা। যেমন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেখলে, মেয়েরা ছেলেদের থেকে পিছিয়ে আছে, এবং তাই মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সূচকগুলো আলাদা করে দেখা উচিৎ । আসলে উন্নয়নের আলোচনায় অনেক সময়েই আমরা ধরে নি যে যত বৈষম্য আছে তা মূলত অর্থনৈতিক কারণে । কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা (যেমন আয়) বা অর্থনৈতিক সামর্থ্যের নির্ধারক উপাদানগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, তার মধ্যে সামাজিক নানা উপাদান আছে। মেয়েরা যদি শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়, তাহলে অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামর্থ্যের যে সহজ সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, সেটা প্রযোজ্য হবেনা। একই যুক্তি খাটে বর্ণ বা অন্য ধরণের সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে (যেমন তফশিলী জাতি বা আদিবাসী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) । নৈতিক দিক যদি বাদও দিই, দেশের অর্থনৈতিক দক্ষতার (economic efficiency) ওপরে এর কুপ্রভাব পড়বে, সার্বিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক রয়ে যাবে।[iv] তাই উন্নয়নের আলোচনায় যে সূচকই ব্যবহার করা হোক, লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর আপেক্ষিক উন্নয়নের মান এবং বৃদ্ধির হার কিরকম, গড় আয়ের মান ও বৃদ্ধির হারের পাশাপাশি সেটাও দেখতে হবে।

তৃতীয়ত, আমরা যদি সব কিছু ছেড়ে উন্নয়নের আর্থিক দিকের ওপরই মনোনিবেশ করি, তাহলেও একটা বড় সমস্যা হল এই সূচক গুলোতে আয়ের ওঠাপড়া একেবারেই ধরা পড়েনা। অথচ অসংগঠিত ক্ষেত্রে বাঁধা মাইনের সুরক্ষা না থাকায় দরিদ্র মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী হল ঝুঁকি। গড় আয় দারিদ্র্য রেখার ওপরে হলেও, এই আয় যত অনিশ্চয়তার শিকার হবে, উন্নয়নের সূচকের

মান তত কম হওয়া উচিৎ। এইরকম সূচক তাত্ত্বিক দিক থেকে তৈরি করা কঠিন না হলেও, ব্যাবহারিক দিকে তার প্রচলন নেই বললেই চলে।

এত সূচক ও তাদের ভালো মন্দ বিচারে পাঠকের ধন্দ লেগে যেতে পারে, কিন্তু এদের পেছনে যে মূল ভাবনা চিন্তা গুলো আছে, সেগুলো বোঝা খুব শক্ত নয়। মানুষের স্বাস্থ্যের যেমন অনেক দিক আছে, এবং সেগুলো নিয়ে অনেকরকম পরীক্ষা করা যেতে পারে, এবং তাদের ফলাফল দেখে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ আন্দাজ করা যেতে পারে, উন্নয়ন ও তার বিভিন্ন সূচকের ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। তার ওপর দেশের উন্নয়ন সমস্ত নাগরিকের উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল । কিন্তু প্রত্যেক নাগরিকের উন্নয়নের কোন কোন দিক দেখা হবে, সেগুলো নৈর্ব্যক্তিক না ব্যক্তিগত অনুভূতি নির্ভর, এবং তারপর কিভাবে তাদের একত্র করে সার্বিক উন্নয়নের সূচক বার করা হবে, সেটা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। যদি কোন দেশে বা রাজ্যে সবাই সমান হত, তাহলে সবার আয় বা প্রত্যাশিত আয়ু ইত্যাদিও সব সমান হত, তাই এসবের গড় মান দেখাটাই যথেষ্ট হত, বৈষম্যের কথা ভাবতে হতনা । কিন্তু, তাহলেও আয় না আয়ু না শিক্ষা না স্বাস্থ্য না জীবন নিয়ে তৃপ্তি কোনটা জীবনযাত্রার মানের সঠিক মাপকাঠি তা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে । আবার এই মাপকাঠির যে কোন একটি (বা তাদের কোন সমষ্টি) নিয়ে যদি আমরা একমত হতেও পারি, যেহেতু মানুষে মানুষে অনেক তফাৎ, সেই বৈষম্য কি করে মাপা হবে তা নিয়েও বহুমত থাকতে পারে।

৩

উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক অনেক সময়েই বিভিন্ন সূচকের ভালোমন্দ নিয়ে বিতর্কে গিয়ে দাঁড়ায় । প্রথমত, এই মতভেদের পেছনে অনেক গুলো কারণ আছে । তার একটা বড় কারণ হল মতাদর্শ বা সমাজ কল্যাণ নিয়ে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি, আরেকটা হল, কিসে কি হয়, কোনটা উপসর্গ আর কোনটা রোগের কারণ সেই নিয়ে মতভেদ। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের নানা সূচকের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা

করার সময় একটা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভুললে চলবেনা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নয়নের যে সূচক গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়, তা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাও হতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা করার সময় এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখা উচিৎ। এই দুটি বিষয় নিয়ে এবার আলোচনা করব।

যাঁরা গড় আয় বা তার বৃদ্ধির হারের ওপরই গুরুত্ব দেন, তাঁদের মধ্যে দুটো দল আছে। একদল মনে করেন সার্বিক উন্নয়নের এটাই সবচেয়ে ভাল সূচক, অন্যদল মনে করেন এটার উন্নতি হলে বাকিগুলোতেও হবে, যার মধ্যে হয়ত তাঁদের পছন্দের সূচকও আছে (যেমন, দারিদ্র দূরীকরণ)। প্রথম দলের কাছে আয়ের বৈষম্য স্বাভাবিক একটা ব্যাপার - কেউ বেশি দক্ষ কেউ কম, কেউ পরিশ্রমী কেউ অলস - তাই সেটা নিয়ে অত চিন্তা না করলেও চলবে। শুধু তাই না, বৈষম্য কমাতে গিয়ে পুনর্বণ্টন করতে গেলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল জাতীয় আয় কমা, কারণ করের ভার যত বাড়বে লোকের কাজ বা বিনিয়োগ করার উৎসাহ তত কমবে। মজার ব্যাপার হল, এই ধরণের মত পাশ্চাত্যে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হলেও, আমাদের দেশে এটা তুলনায় কম শোনা যায়। তাই এক অর্থে আমাদের (অর্থনৈতিক চিন্তার দিক থেকে) দক্ষিণপন্থীরাও অনেকেই পাশ্চাত্যের নিরিখে বামপন্থী! অর্থাৎ তাঁরা সামাজিক উদ্দেশ্য হিসেবে দারিদ্র্য-দুরীকরণের গুরুত্ব অস্বীকার করেননা, তার পথ নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা যাই হোকনা কেন। তার কারণ সম্ভবত আমাদের চোখের সামনে সবচেয়ে পরিশ্রম করে যাঁরা, তাঁরা দরিদ্র শ্রেণীর লোক, এবং তাঁদের আর্থিক দুর্দশার মূল কারণ যে সুযোগের অভাব, এটা অস্বীকার করা অসম্ভব। তাই আমাদের দেশে যাঁরা গড় আয় ও তার বৃদ্ধির দিকেই ঝোঁক দেন, তাঁদের অনেকেরই চিন্তা হল এর ফলে দরিদ্রদের অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়বে, মজুরি বাড়বে, এবং সরকারি কর সংগ্রহ বাড়বে যা দারিদ্র্য দূরীকরণের নানা প্র কল্পের খরচ মেটাতে সহায়ক হবে। আবার যাঁরা বৈষম্যের ওপর গুরুত্ব দেন, তাঁরা মনে করেন দরিদ্রশ্রেণীর মানবসম্পদ বিকাশের ফলে জাতীয় আয় বাড়বে, তাই একে

বিনিয়োগ হিসেবে দেখা উচিৎ। তাই মাত্রার মধ্যে রাখলে পুনর্বণ্টনের ফল নেতিবাচক নয়, সদর্থক হতে পারে। তাই দুই পক্ষের মতবিরোধ সবসময়ে মতাদর্শের নয়, একই গন্তব্যে পৌঁছনর বিভিন্ন পথ নিয়ে। যেমন সেন-ভগবতী বিতর্কে দুপক্ষের মতানৈক্য (অন্তত তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী) দারিদ্র্য-দূরীকরণের পথ নিয়ে, উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

কিন্তু পথের দিশা কিভাবে পাওয়া যাবে, তা শুধু উন্নয়নের সূচক থেকে জানা যাবেনা। এগুলি উপসর্গমাত্র, কি থেকে কি হয় সেটা বুঝতে গেলে আরও অনেক গভীরে যেতে হবে। যেমন, অনেকেই মনে করেন গড় আয় বাড়লে দারিদ্র্য কমবে, এবং ওপর ওপর পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এই দুই সূচকের মধ্যে একটা পারস্পরিক সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনটা কোনটার কারণ, সেটা বার করা সহজ নয়। জাতীয় আয় বাড়লে তার কারণে দারিদ্র্য কমতে পারে, আবার দারিদ্র্য কমলে তার কারণে জাতীয় আয় বাড়তে পারে। আবার এমনও হতে পারে, কোন সরকারি নীতি বা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে (যেমন, পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ, কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, রপ্তানির নতুন বাজার খুলে যাওয়া বা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার) এই দুই সূচকেরই উন্নতি হল কিন্তু কোনটাই কোনটার প্রত্যক্ষ কারণ নয়।

শুনে যদি মনে হয় এ সব বড্ড অ্যাকাডেমিক কথা, তাহলে উন্নয়নের নীতি নিয়ে বহুপ্রচলিত মতগুলো একটু ভালো করে যাচাই করলে সেটা আর মনে হবেনা। যেমন ভগবতী ও পানাগাড়িয়া যে বলেছেন গড় আয় বাড়লে দারিদ্র দূর হবে, তার জন্য পরিসংখ্যান দেখলে একটা পারস্পরিক সংযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু যে কার্যকারণের সম্পর্কের কথা তাঁর বইতে বলা আছে, অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা বাড়া এবং তার জন্যে মজুরির হার বাড়া, তার পক্ষে জোরদার প্রমাণ বার করা মুশকিল, কারণ আর্থিক বৃদ্ধির তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির হার অনেক কম বলে দেখা যাচ্ছে। আবার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি স্কুলগুলির নানা সমস্যা মেনে নিলেও, জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেনের মতে সরকারি স্কুলগুলোর রোগ সারিয়ে

তোলাই সমাধানের পথ, বেসরকারি স্কুলের ওপর নির্ভর করা নয় । তাঁদের মতে ইতিহাসের শিক্ষা হল যে দেশেই উন্নয়ন হয়েছে, সেখানেই সরকারি স্কুলব্যবস্থার প্রসার হয়েছে। আবার আমাদের ভাবতে হবে, যে এই পারস্পরিক সংযোগ কি কোন আবশ্যক কার্যকারণের সম্পর্ক প্রমাণ করে? এমনও তো হতে পারে যেখানে উন্নয়ন হয়েছে সেখানে সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়েছে, তাই জাতীয় আয়ও বেড়েছে, আবার সরকারি স্কুলব্যবস্থারও উন্নতি ও প্রসার হয়েছে। ঘটনা হল, যেটুকু তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, তাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্তত দেশের গ্রামাঞ্চলে সরকারি স্কুল যতখানি লেখাপড়া শেখাতে পারে, বেসরকারি স্কুল প্রায় ততটাই করতে পারছে অনেক কম খরচে (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) এবং ছাত্রদের শিক্ষার মান সরকারি স্কুলের ছাত্রদের থেকে কোন অংশে কম নয়। তাই, সরকারি স্কুলব্যবস্থার প্রসারই একমাত্র পথ, এই সিদ্ধান্তে আসার মত তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, এবং বেসরকারি স্কুলের সমস্যা সত্ত্বেও তার ভূমিকা উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের ওপর বিভিন্ন সরকারি নীতি ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব বুঝতে পারস্পরিক সংযোগ ছাড়িয়ে কার্যকারণের সম্পর্ক (causality) প্রতিষ্ঠা করা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক উন্নয়নের অর্থনীতির গবেষণার মূলধারা সম্প্রতি এই বিষয়ে মনোযোগী হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়, কৃষকদের নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, বা দারিদ্র্য-দূরীকরণ প্রকল্প (যেমন, সদ্য পাশ হওয়া খাদ্য বিল) কি ভাবে পরিকল্পনা ও রূপায়িত করা উচিৎ সেই দিকে নজর দেওয়া, শুধু এতো টাকা নিয়োগ করা হয়েছে বা হওয়া উচিৎ বলে বসে না থাকা, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অপচয় ও দুর্নীতির ফলে এর খুব অল্প একটা অংশই দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছোয় ।[v]

এবার আসি উন্নয়নের আলোচনার যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সেটা নিয়ে আলোচনায়। যেকোনো সরকার যখন কোন নীতি অনুসরণ করে, সেটার পেছনে উন্নয়নের যে দর্শন বা সূচকই থাক না কেন, একটা রাজনৈতিক হিসেব ও থাকে।

গণতন্ত্রে বিরোধী দল, জনমত, মিডিয়া, আইন-ব্যবস্থা এবং নাগরিক সমাজের চাপে সরকারি দলের পছন্দের যে নীতিই হোকনা কেন, তার থেকে কিছুটা পেছনে সরতে হয়, কিছুটা আপস করতে হয়। এর খারাপ দিক আছে যে কোন সংস্কার, আখেরে যাতে হয়তো সবারই ভালো হবে, সেগুলোও অনেক সময় আটকে যায়। আবার এর ভালো দিক হল, সরকারের বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মতামত যাই হোকনা কেন, উন্নয়নের নানা সূচক নিয়ে সবসময়েই বিতর্ক চলছে, তাই যে কোনও সূচকের প্রভুত উন্নতি হয়েছে বলে সরকার বসে থাকতে পারেনা, তাদের অন্যান্য সূচকে কেন উন্নতি হয়নি সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তাই গুজরাটে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়নি বলে, মোদীকে “আজকাল মেয়েরা ডায়েটিং বেশি করছে” এরকম আজগুবি কথা বলতে হয়, এবং তার জন্য যথাযোগ্য প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই চাপগুলো না থাকার কিছু ভালো দিক আছে, যেমন আবশ্যক কিন্তু স্বল্প-মেয়াদে অপ্রীতিকর নীতি প্রয়োগে বাধা নেই। কিন্তু খারাপ দিক হল, উন্নয়নের নীতি নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ একনায়ক (বা পার্টির) ইচ্ছেমত যেখানে বিভিন্ন সূচকের মধ্যে যে টানাপোড়েন সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হতে পারে। চিনে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারের ওপর এতটাই জোর দেওয়া হয়, যে বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্যপালদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক আয় বৃদ্ধির হারের ওপর নির্ভর করে। একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে এর ফলে, সেই সব প্রদেশের পরিবেশদূষণের হার আপেক্ষিকভাবে অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে (অর্থাৎ, এই চাপ না থাকলে শুধু আর্থিক বৃদ্ধির জন্যে যতটা দূষণ হত, তার থেকে বেশি) ।[vi] যেহেতু ওই দেশে গণতন্ত্রের সুরক্ষা কবচগুলি নেই, পরিবেশ দূষণের এই সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির টনক না নড়লে, ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। একই ব্যাপার দেখা গেছে ওই দেশে “এক সন্তান নীতির” ক্ষেত্রে। এর ফলে জনসংখ্যায় মেয়েদের অনুপাত কমেছে, এবং তার ফলে যে সামাজিক সমস্যাগুলি হবার, তার মাত্রা বাড়ছে।

আমার বক্তব্য এই নয় যে ভারতে পরিবেশ-দূষণ বা লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের সমস্যা নেই। একথাও অনস্বীকার্য যে ভারতের তুলনায় গড় জাতীয় আয়ের মান বা বৃদ্ধির হার শুধু নয়, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের অধিকাংশ সূচকের ক্ষেত্রেই চিন অনেকটা এগিয়ে আছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে দুটো সূচকের ক্ষেত্রে নেই, তা হল পরিবেশ দূষণের মাত্রা এবং জনসংখ্যায় লিঙ্গ-অনুপাত (gender ratio) এবং এই ব্যাপারটার সাথে আমি চিন ও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য সম্পর্ক আছে বলে মনে করি । আবার এও সত্যি লিঙ্গ-ভিত্তিক উন্নয়নের সূচকগুলো দেখলে, জাতীয় আয় ও তার বৃদ্ধির হারে ভারতের থেকে পিছিয়ে থাকলেও, এদের মধ্যে অনেকগুলোতে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে । তাই ভারতের সরকারি নীতিতে জনসংখ্যার অর্ধাংশের গুরুত্ব কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের একটা মূল ধর্ম যদি হয় যে সরকারের নীতি সমাজের একটা বড় অংশের কল্যাণের ওপর মনোযোগী হবে। সেই নিরিখে ভারত মোটেই গণতন্ত্রের আদর্শ নমুনা নয়, ক্রমবিকাশের একটা পর্যায়ে আছে, এই মাত্র ।

যে কোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত উন্নত হবে, যত বিকশিত হবে, তত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির ওপর জোর দিলে ক্ষতি কম কারণ, গণতন্ত্রের নানা রক্ষাকবচের ফলে (যার মধ্যে মিডিয়া, নাগরিক সমাজ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতায় আসার জন্যে প্রতিযোগিতাও আছে) অন্য সব সূচক সম্পূর্ণ অবহেলা করে শুধু বৃদ্ধির হার কত বেশি করা যায়, এই প্রবণতা কম হবে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, একটা দেশের গণতন্ত্রর বিকাশ যত হয়, জাতীয় আয়ের অনুপাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-র ওপরে সরকারি খরচ তত বাড়ে।[vii] শুধু তাই নয়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে ফল, অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতা, যার প্রতিফলন হয় সরকারি রাজস্বে, তার অন্তত খানিকটা অংশ সামাজিক এবং মানব উন্নয়নে নিয়োজিত হবার সম্ভাবনা বেশি বলে আশা করা যায়।[viii] কোন দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ যত সীমিত হবে, সে দেশের উন্নয়নের বিচার করতে গেলে তত বেশি

জোর দিতে হবে মানব উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, এবং পরিবেশ-কেন্দ্রিক সূচক গুলোর ওপর। অন্যভাবে বললে, একই জাতীয় আয় বা তার বৃদ্ধির হার, কোন দেশে সার্বিক উন্নয়নের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তার একটা বড় নির্ধারক হল সেই দেশ আদৌ গণতান্ত্রিক কিনা, বা হলেও, গণতন্ত্রের বিকাশের কোন স্তরে আছে।

আমাদের গণতন্ত্র ত্রুটিহীন নয়, এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে তার প্রসার অসমান, তাই উন্নয়নের নানা সূচক নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক চলুক, চলতে থাকুক। অনেক দেশে কিন্তু এই বিতর্কটাও করা যায়না। তাই অন্য দেশের সাথে উন্নয়নের সূচকের তুলনা করার সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যটা খেয়াল রাখা উচিৎ।

সূত্র

১। Ashok Koktwal, Bharat Ramaswami, and Wilima Wadhwa (2011): "Economic Liberalization and Indian Economic Growth: What's The Evidence?", Journal of Economic Literature, December 2011

২। Jean Dreze and Amartya Sen (2013): An Uncertain Glory : India and Its Contradictions, London: Allen Lane.

৩। Jagdish Bhagwati and Arvind Panagariya (2012): India's Tryst with Destiny: Debunking Myths that Undermine Progress and Addressing New Challenges, Noida: Collins Business.

৪। Abhijit Banerjee and Esther Duflo (2010): Poor Economics: Rethinking Poverty and the Ways to End It, Noida: Random House.

৫। Ruixue Jia (2013): "Pollution for Promotion", Working Paper, IIES, Stockholm University.

৬। Reza Baqir (2002): "Social Sector Spending in a Panel of Countries", IMF Working Paper 02-35.

---

[i] যদিও সত্যের খাতিরে মানতেই হবে বিতর্কটা একটু একপাক্ষিকই ছিল - প্রায় পুরোটা সময় ভগবতী মিডিয়াতে "কামেন ফাইট, কামেন ফাইট" করে গেলেন, এবং অমর্ত্যবাবু রইলেন নীরবে।

[ii] এখানে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান সেন ও দ্রেজ, ভগবতী ও পানাগাড়িয়ার বই এবং অশোক কোটওয়াল, ভরত রামস্বামী, ও উইলিমা ওয়াধওয়ার প্রবন্ধ থেকে আহৃত।

[iii] যেমন, মহাভারতে বকরূপী ধর্ম যখন যুধিষ্ঠির কে জিজ্ঞেস করেন সুখী কে , তাঁর "সঠিক" উত্তর ছিল যে ঋণী নয়, এবং দিনের শেষে যে নিজের ঘরে শাক-ভাত খেতে পারে, সেই সুখী। এই উত্তর সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হতে পারে । স্বচ্ছল পরিবারের এক শিশুর বলা গল্পে একজন "গরিব আর দুঃখী" মানুষের কথা শুনেছি যে, তার পরিবারের সদস্যরা, গৃহসেবক, পরিচারিকা, মালি, এমনকি ড্রাইভারও নাকি সবাই খুব গরিব আর দুঃখী ছিল।

[iv] তাছাড়া শিশুর স্ব্যাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে মায়ের শিক্ষার পারস্পরিক সংযোগ (correlation) খুব জোরালো, তাই এ দিক থেকে দেখলেও মেয়েদের শিক্ষার সূচক আলাদা করে দেখা প্রয়োজন।

[v] এই নিয়ে অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় ও এস্থার ডুফ্লোর বই-এ বিস্তারিত আলোচনা আছে। তবে তাঁরা মূলত যদৃচ্ছ পরীক্ষামূলক পন্থার (randomized experiments) ওপর জোর দিয়েছেন, এ ছাড়াও অনেক ধরণের প্রণালী ব্যবহৃত হচ্ছে ।

[vi] রুইশু জিয়া-র ২০১৩ সালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[vii] রেজা বকিরের ২০০২ সালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

[viii] বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে হাজারো দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একাধিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। এর মধ্যে গ্রামীণ কর্ম সুরক্ষা প্রকল্প, সর্ব শিক্ষা অভিযান, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য বীমা থেকে সদ্য লোকসভায় পাশ হওয়া খাদ্য নিরাপত্তা বিল সবই আছে এবং এগুলো সম্ভব হয়েছে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব বাড়ার ফলে।